স্বাধীনতার সুখ

উপনিবেশবাদীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে তাগুতের অত্যাচারে জর্জরিত হওয়ার নাম স্বাধীনতা নয়। কক্ষনও নয়। 'স্বাধীনতা' দুনিয়ার কোনো শক্তির সামনে মাথা নত না করার নাম।

আমাদের বাড়ির পাশে বিশাল এক শিমুল তুলোর গাছ ছিলো। সে গাছে অনেকগুলো টিয়ে পাখির বাসা ছিলো। লাল ঠোটের বড় লেজের টিয়েগুলোর কিচিমিচির শব্দ শুনতে বেশ ভালো লাগতো। শিমুল গাছটিতে কিছু কোটর ছিলো। টিয়েগুলো সেখানেই বাস করতো। চাচ্চু একবার টিয়ে ধরার প্ল্যান করলো। আমি তখন খুব ছোট। ক্লাস ফাইভে পড়ি। বেশ আগ্রহ নিয়ে টিয়ে ধরার দৃশ্য দেখছি। প্রথমে লম্বা বাঁশের মাথায় একগুচ্ছ খড় লাগানো হলো। এরপর একটি কোটর সোজা করে বাঁশটি স্থাপন করা হলো। যেই একটি টিয়ে কোটরে ঢুকলো, ওমনিই খড় লাগানো বাঁশ দিয়ে কোটরটি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

এরপর একজনকে গাছে তুলে দেওয়া হলো। লোকটা গাছে উঠার আগে সাথে করে একটি ময়লা কাপড় নিয়ে গেলো। গাছে উঠে প্রথমে কাপড়টি হাতে পেঁচিয়ে নিলো। অবশ্যি তারও একটা কারণ আছে। টিয়ের ঠোঁট খুব শক্ত। কামড় বসিয়ে দিলে আর রক্ষে নেই। কামড় থেকে বাঁচতেই হাতে কাপড় প্যাঁচাতে হলো। লোকটি কাপড় পেঁচিয়ে কোটরে হাত দিলো। এরপর একটি টিয়ে সাথে করে নেমে এলো।

হাতের কাছে টিয়ে পেয়ে আমি তো খুশিতে আত্মহারা। খুব আগ্রহ নিয়ে টিয়ের পরিচর্যা করতে লাগলাম। টিয়ে পাখি নাকি মরিচ খেতে বেশি পছন্দ করে। আমি আব্বুকে দিয়ে লাল মরিচ কিনিয়ে আনলাম। খাঁচার ফাঁক দিয়ে মরিচগুলো টিয়েকে খাওয়াতে লাগলাম। প্রথম প্রথম টিয়েটি খুব ডাকাকডাকি করতো। কিন্তু আস্তে আস্তে সে ডাকাডাকি বন্ধ করে দিলো। যে মরিচ ছিলো তার প্রিয় খাবার, সেটি খেতেও তার অনীহা দেখা গেলো। এক পর্যায়ে টিয়েটি নিস্তেজ হতে লাগলো। চাচ্চু ওর জন্যে বড় খাঁচার ব্যবস্থা করলেন। চাচ্চু ভেবেছিলেন—হয়তো বড় খাঁচা পেলে ও সব কষ্ট ভুলে যাবে। কিন্তু বড় খাঁচা আর লাল টকটকে মরিচ টিয়েকে সুখ দিতে পারলো না। দিনদিন ও আরও নিস্তেজ হতে লাগলো। এক সময় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলো। শত চেষ্টা করেও তাকে আর খাবার খাওয়ানো গেলো না।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি খাঁচা খালি। আমি তো অবাক! কী ব্যাপার? টিয়ে কোথায়? দৌড়ে গিয়ে মা-কে জিজ্ঞেস করলাম টিয়ে কোথায়। মা বললেন, ভোরে তিনি টিয়েকে মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি কান্না শুরু করলাম। মা বুঝালেন। তিনি বললেন, পাখিরা খাঁচায় থাকতে পছন্দ করে না। খাঁচায় আটকিয়ে পাখিকে যতই আদর-যত্ন করা হোক না কেন, লাভ নেই। এতে ওরা সুখ পায় না। বন্দী খাঁচায় লাল মরিচ খাওয়ার মধ্যে কোনো সুখ নেই। মুক্ত বাতাসে উড়ে বেড়ানোর মধ্যেই ওদের সুখ।

সত্যিই, মা এক বিন্দুও মিথ্যে বলেননি। ছোটবেলায় আমরা ভাব সম্প্রসারণ পড়েছিলাম—'বন্যেরা বন্যে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' সোনার খাঁচায়ও যদি পাখিদের আটকে রাখা হয়, তবুও ওরা তৃপ্তি অনুভব করে না। ওদের তৃপ্তি মুক্ত বাতাসে। নীল আকাশে।

পারসিয়ান সেনাপতি রুস্তমের নাম কে না জানে? ইতিহাসে যে কজন সাহসী যোদ্ধার নাম পাওয়া যায়, রুস্তম তাদেরই একজন। যেমন ছিলো তার শক্তি, তেমন ছিলো তার বীরত্ব। রুস্তমের সাথে একবার সাহাবাদের যুদ্ধ হলো। ইতিহাস সে যুদ্ধকে কাদেসিয়ার যুদ্ধ নামেই চেনে। সাহাবাদের মোকাবিলা করার জন্যে রুস্তম তার বাহিনী প্রস্তুত করলো। কাদেসিয়ার প্রান্তরে দু বাহিনী মিলিত হলো। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু), আর পারস্যের সেনাপতি ছিলো রুস্তম।

মুসলিমরা কেন পারস্যের মতো সুপার পাওয়ারের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে? তাদের উদ্দেশ কী? পারস্যের সাথে মোকাবিলা করার মতো সাহস তারা কোথায় পেলো? এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে রুস্তম একজন প্রতিনিধি পাঠাতে বললো।

রিবিয়ি ইবনু আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) মুসলিম বাহিনীর প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন। হালকা পাতলা গড়নের একটি ঘোড়ায় চড়ে তিনি রুস্তমের দরবারে পৌঁছলেন। তাঁর গায়ে ছিলো কম দামি পোশাক। তাই রক্ষীরা তাঁকে আটকে দিলো। তারা বললো, 'তুমি কার সাথে দেখা করতে এসেছো, জানো? এই পোশাকে তোমাকে আমরা ভেতরে যাবার অনুমতি দিতে পারি না। যাও, পোশাক পাল্টে স্মার্ট হয়ে এসো।'

রিবিয়ি ইবনে আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) তাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। পোশাকের মধ্যে সম্মান নেই, সম্মান হলো তাকওয়ার মধ্যে। এই শিক্ষাই নবীজি ﷺ তাঁদের দিয়েছেন। তাই তিনি বললেন, 'আমি স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি। তোমাদের সেনাপতি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। যদি এভাবেই যেতে দাও তো যাবো, নয়তো এখান থেকেই বিদেয় নেবো।'

রিবিয়ি (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর দৃঢ়তার সামনে ওরা নত হলো। তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হলো। তবে শর্ত হলো তলোয়ার জমা দিতে হবে। খালি হাতে রুস্তমের সাথে দেখা করতে যেতে হবে। ইবনু আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) এবারও তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'আমাকে যদি এভাবেই প্রবেশ করতে দাও তো করবো, নয়তো যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যাবো।'

রক্ষীরা পড়লো মহা যন্ত্রণায়। এই লোকটা তাদের মুখের ওপর কথা বলছে। লোকটা কি জানে না, তারা সুপার পাওয়ার পারসিয়ান সম্রাটের লোক? লোকটা কি জানে না, যে-কোনো সময় তার গর্দান চলে যেতে পারে? তাহলে? এত সাহস লোকটি কোথায় পেয়েছে? ওরা রুস্তমের কাছে ইবনু আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর অবস্থা বর্ণনা করলো। অগত্যা রুস্তমও রাজি হলো। রিবিয়ি ইবনু আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) ঘোড়ায় চড়ে রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করলেন। ঘোড়ার আঘাতে রুস্তমের লাল গালিচা ছিঁড়ে গেলো। উপস্থিত লোকেরা এই

দৃশ্য দেখে অবাক হলো। ইবনু আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) যখন তাঁর তলোয়ার দিয়ে কার্পেট ছিদ্র করে নিজের ঘোড়া বাঁধলেন, তখন তাদের চোখ কপালে উঠে গেলো। উঠবেই না কেন বলো! আজ যদি কেউ হোয়াইট হাউজে গিয়ে এমনটা করে, তো লোকজন তাঁকে দেখে অবাক হবে না? অবশ্যই হবে। সে সময়কার রুস্তমের প্রাসাদ আজকের হোয়াইট হাউজের থেকে কম কীসে? রুস্তম রিবিয়ি ইবনু আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু)-কে বললো, ‘আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে তোমাদের কে পাঠিয়েছে?’

রিবিয়ি ইবনু আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) নির্ভয়ে জবাব দিলেন, ‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা। আল্লাহ আমাদেরকে এখানে আসার নির্দেশ দিয়েছেন।’

ইবনু আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর উত্তর শুনে রুস্তমের ভ্রূ কুঁচকে গেলো। সে বললো, ‘কী উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা এখানে এসেছো?’

ইবনু আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) বললেন, ‘আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করার জন্যে। সংকীর্ণ পৃথিবীর মোহ থেকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। বহু উপাস্যের অত্যাচার থেকে ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম ইসলামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে (আমরা এখানে এসেছি)।’[1]

আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধ দেখেছি। ১ম বিশ্ব যুদ্ধ, ২য় বিশ্ব যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ইত্যাদি। এই যুদ্ধগুলোর উদ্দেশ কী ছিলো? এক কথায় যদি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়, তাহলে উত্তরটা হবে—ক্ষমতা। ক্ষমতার জন্যেই এসব যুদ্ধ হয়েছিলো। যার জন্যে জীবন দিতে হয়েছিলো কোটি কোটি মানুষকে। কিন্তু এসব যুদ্ধ কি মানুষকে স্বাধীনতা এনে দিতে পেরেছিলো?

আচ্ছা, স্বাধীনতার সংজ্ঞা কী? আমি যদি তোমাকে স্বাধীনতার সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করি, তাহলে তুমি কী বলবে?

– নিজ মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করা।

– ভিনদেশি শত্রুর হাত থেকে নিজ দেশকে মুক্ত করলেই কি স্বাধীন হওয়া যায়?

– তাহলে?

– ভিনদেশি শত্রু থেকে মুক্ত হওয়ার নাম স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা হলো মানুষের গোলামি থেকে মানুষকে মুক্ত করা। আমি স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক সংজ্ঞা দেখেছি। কিন্তু কোনো সংজ্ঞাই আমাকে ততটা পরিতৃপ্ত করতে পারেনি, যতটা রিবিয়ি ইবনু আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর সংজ্ঞা করেছে। কেবল কিছু এলাকা শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার নাম স্বাধীনতা নয়। ভিনদেশি কোনো শক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, নিজ দেশের লোকের দাসত্ব করার নাম স্বাধীনতা নয়। উপনিবেশবাদীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে তাগুতের অত্যাচারে জর্জরিত

হওয়ার নাম স্বাধীনতা নয়। কক্ষনও নয়। 'স্বাধীনতা' মুক্তভাবে জীবন-যাপন করার নাম। 'স্বাধীনতা' নিজেকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে বন্ধনহীন করার নাম। 'স্বাধীনতা' দুনিয়ার কোনো শক্তির সামনে মাথা নত না করার নাম।

টিয়ে পাখিকে বড় খাঁচায় আবদ্ধ করে লাল মরিচ খাইয়েও সুখী করা যায়নি। কারণ, ওর সুখ মুক্ত বাতাসের মধ্যে; সোনার খাঁচার মধ্যে নয়। ঠিক তেমনই মানুষের সুখ স্বাধীনতার মধ্যে, দাসত্বের মধ্যে নয়। আর সে সুখ কেবল তখনই আসতে পারে, যখন মানুষ শত ইলাহের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর গোলামিতে লিপ্ত হবে। দুনিয়ার মোহ থেকে আখিরাতের কল্যাণের দিকে ধাবিত হবে। তাগুতি শক্তির সামনে মাথা উঁচু রেখে, একমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা অবনত করবে। ছোটবেলায় 'স্বাধীনতার সুখ' নামে একটা কবিতা পড়েছিলে, মনে আছে? আমি একটু পড়ি?

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,

'কুঁড়ে ঘরে থাকি কর শিল্পের বড়াই,

আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে

তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।'

বাবুই হাসিয়া কহে, 'সন্দেহ কি তায়?

কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।

পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা

নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।'

চড়ুই পাখি প্যারাসাইটের মতো অন্যের ঘরে বাসা বাঁধে। অন্যের অট্টালিকা থেকে সুবিধে নেয়, কিন্তু বাবুই তা করে না। সে নিজ হাতে বাসা বুনে। আর স্বাধীনচিত্তে ওই বাসায় অবস্থান করে। তাই চড়ুই পাখির চেয়ে সে স্বাধীনতার সুখ বেশি উপলব্ধি করে। আমি তোমাকে চড়ুই না হয়ে বাবুই হতে বলছি। কেন জানো? কারণ আমি চাই তুমি স্বাধীন হও। দুনিয়ার শত ইলাহের গোলামি থেকে নিজেকে মুক্ত করো।

হয়তো মনে মনে নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারো, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তুমি স্বাধীন নও। স্বাধীনতার সুখ এখনও তোমার কপালে জুটেনি। হয় তুমি টাকার গোলাম, নয়তো গার্লফ্রেন্ডের গোলাম, নয়তো তাগুতের গোলাম, নয়তো নেতার গোলাম। বিশ্বাস করো, এই গোলামির জীবনের মধ্যে কোনো সুখ নেই, কোনো পরিতৃপ্তি নেই, কোনো

বীরত্ব নেই। স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচার মধ্যে বীরত্ব আছে। বিড়ালের মতো হাজার বছর বাঁচার মধ্যে বীরত্ব নেই, সিংহের মতো একদিন বেঁচে থাকার মধ্যেও বীরত্ব আছে।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি

[1] ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *উমার ইবনুল খাত্তাব,* ২/২৯৭-২৯৮।